জিহাদের উদ্দেশ্যসমূহ

শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল লিব্বি রহঃ

আল-ফজর

জিহাদের উদ্দেশ্যসমূহ

শায়খ

আতিয়াতুল্লাহ আল লিব্বি রহিমাহুল্লাহ

১৪৩৬ হিঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবা ও যারা তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর। তারপর:

আমরা তাওহিদের আলোচনা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। আমরা বলে এসেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের জন্য জিহাদ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তা আমাদের উপর ফরজ ও আবশ্যক করেছেন, যেন তার কালিমা, তার দ্বীন ও তার শরীয়তই সর্বোচ্চ হয় এবং ফিৎনার কোন অস্তিত্ব না থাকে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনফালে বলেন:

> {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}
>
> "তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যাবৎ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা এই আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করেছেন-

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى) "তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যাবৎনা..." অর্থাৎ এই সীমা পর্যন্ত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর জিহাদ ফরজ ও বিধিবদ্ধ করেছেন কতগুলো উদ্দেশ্যে, যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি হল, তাওহিদ বাস্তবায়ন করা, তা প্রতিষ্ঠিত করা, তার সংরক্ষণ করা ও তার হেফাজত করা। আমরা সামনে তাওহিদ সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রথমে আলোচনা করছি এই আয়াত সম্বন্ধে-

আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَقَاتِلُوهُمْ "তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।"

"তোমরা যুদ্ধ কর"- এটা যুদ্ধের আদেশ। (قَاتل يُقاتِل مُقاتلةً وقتالًا، والأمرُ قاتِلْ) একবচনে قاتِلْ , বহুবচনে قاتلو ।

'তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর'- তারা কারা? এই সর্বনামটির উদ্দিষ্ট সত্তা হল পূর্বের আয়াতে উল্লেখিত কাফেররা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ}

"যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদেরকে বলে দাও, তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা কিছু হয়েছে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা যদি পুনরায় সে কাজই করে, তবে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তা তো তাদের সামনে রয়েছেই...। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যাবৎ না ফিৎনা নিমূল হয়।"

অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর এই লক্ষ্যে...। এটা যুদ্ধের আদেশ।

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}

"তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যাবৎ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"

অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

আরবিতে حَتَّى (যাবৎ না) শব্দটি হচ্ছে প্রান্ত বোধক অব্যয়। আরবি অভিধানে এর অনেকগুলো অর্থ ও অনেক রকমের ব্যবহার আছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থটি হল: শব্দটি প্রান্তবোধক অব্যয়, প্রান্ত বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই 'যতক্ষণ না এটা হয়'র অর্থ হচ্ছে, এই সীমা পর্যন্ত।

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক এই সীমা পর্যন্ত- সেটা কি? সেটা হচ্ছে কোন ফিৎনা অবশিষ্ট না থাকা এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া।

তাহলে আমাদেরকে আদেশ করলেন কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ করতে এই সীমা পর্যন্ত। এটা আমাদের উপর আবশ্যক। আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে, আমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব এই সীমা পর্যন্ত। এখন সেই সীমাটা কি? আমরা এখন তার ব্যাখ্যা করব ইংশাআল্লাহ।

আপনি বলতে পারেন: حَتَّى অর্থ হল ‘যে পর্যন্ত না’। যেমন: ‘যে পর্যন্ত না এমনটা ঘটে’।

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ অর্থাৎ যতক্ষণ না ফিৎনা অবশিষ্ট না থাকে। এই লক্ষ্য পর্যন্ত। অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধ কর এই সীমা পর্যন্ত, এই পরিমাণ।

যে পর্যন্ত না ফিৎনা নির্মূল হয়। ফিৎনা কি?

আলেমগণ এর তাফসীরে বলেন: ফিৎনা হল কুফর ও শিরক। কিন্তু যেকোন প্রকার কুফর ও শিরক উদ্দেশ্য নয়। কেননা ইসলামের বিজয় সত্তেও ইসলামের অধীনতা মেনে কুফর ও শিরক থাকা সম্ভব। যেমন যিম্মীরা।

তাই একেবারে কাফেরদেরকে শেষ করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হল, যতক্ষণ পর্যন্ত এমন ফিৎনা তথা কুফর নির্মূল না হয়, যার ক্ষমতা, কার্যকরিতা ও প্রভাব আছে। এমন প্রভাব, যা মানুষকে ফিৎনায় ফেলতে পারে। এটা হল ফিৎনার প্রকৃত অর্থ। একারণেই কুফর ও শিরককে ফিৎনা শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এমন ক্ষমতা, প্রভাব, শক্তি, কার্যকরীতা এবং প্রকাশ্য ও বিজয়ী শাসন, যার দ্বারা মানুষকে ফিৎনায় ফেলতে পারে, তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফেরাতে ও বাঁধা দিতে পারে।

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} “তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনা অবশিষ্ট না থাকে।”

تَكُونَ. এখানে كان টিকে বলা হয় كان التامة এটা الناقصة নয়। এটা আরবি ব্যকরণের প্রসিদ্ধ كان وأخواتها এর প্রকারের নয়। এটা হচ্ছে كان التامة-{حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} একারণে "فتنة" শব্দটি تَكُونَ এর فاعلٌ (কর্তা); তার اسم নয়।

তাহলে এখানে تَكُونَ হচ্ছে كان التامة। কেনান كان কখনো تامة হয়, কখনো ناقصة হয়। ناقصة এর ব্যাপারেই ব্যাকরণের মধ্যে আলাদা শিরোনামে আলোচনা রয়েছে, যেটাকে ব্যকরণে - باب كان وأخواتها বলে নাম দেওয়া হয়।

কিন্তু تامة যেটা, সেটা হচ্ছে فعلٌ ماضٍ (অতীতকালের ক্রিয়া), যা فاعل কে رفع প্রদান করে এবং তার জন্য فاعل এর প্রয়োজন হয়। তাই এখানে "فتنة" শব্দটি تَكُونَ এর فاعلٌ (কর্তা)।

{حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} অর্থাৎ যতক্ষণ না ফিৎনা না পাওয়া যায়।

"তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিৎনা না থাকে"-ফিৎনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন কুফর ও শিরক, যা প্রকাশ্য ও বিজয়ী, যার কার্যকরীতা, শক্তি ও প্রভাব আছে, যার মাধ্যমে মানুষকে ফিৎনায় ফেলতে পারে, তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন ও তাওহিদ থেকে ফেরাতে পারে।

তার সাথে আরো যোগ করা হয়েছে {حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} *"যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।"*

দ্বীনের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন দ্বীন, যার বিধানাবলী এমনভাবে কার্যকর, যার ফলে আল্লাহর বিধানালী, আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর আইন ও আল্লাহর শরীয়তই একমাত্র কার্যকর থাকে, একমাত্র তার শাসনই চলে এবং তা-ই প্রভাবশালী, বিজয়ী ও প্রকাশ্য থাকে। এমতাবস্থায়ই দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হবে। মানুষ পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগত হয়ে যাওয়া, আল্লাহর জন্য নত হওয়া।

{وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} অর্থাৎ আনুগত্য শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার জন্য হবে, ফলে তার বিধানাবলীই একমাত্র কার্যকর থাকবে। অতএব এটা পূর্বের অংশের পরিপূর্ণতা দানকারী। অর্থাৎ "কোন ফিৎনা থাকবে না এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে।"

তাহলে উভয়টি একই অর্থে। একই অর্থের ভিন্ন আরেকটি বাক্য যোগ করা হয়েছে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য।[১]

---

[১] "দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া" যদি শিরকের দাপট শেষ হওয়ার পর উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে দু'টি বিষয়: ১) তাদের শক্তি নি:শেষ হওয়া।২) শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

দ্বীনের কার্যকরীতা বাস্তবায়িত হওয়া, এটা শুধু তাদের প্রভাব নি:শেষ হওয়ারই দাবি করে না, বরং এটাও দাবি করে যে, দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। তাহলে একটি বাক্য নেতিবাচক আর আরেকটি ইতিবাচক।

সেই কুফর, শিরক ও ফিৎনা, যার সকল রূপ ও নিদর্শনের বিরুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালা আমাদেরকে যুদ্ধ করতে, তা নিশ্চিহ্ন করতে ও অচল করতে আদেশ করেছেন তা কি?

কুফরের চিহ্ন বা নিদর্শনাবলী অনেক রয়েছে, আমরা সংক্ষেপে তার কয়েকটির ব্যাপারে আলোচনা করব ইংশাআল্লাহ।

কুফর ও শিরকের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, যা নিশ্চিহ্ন করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদের উপর জিহাদ করা ফরজ করেছেন।

এটা সময়ের আলোকে পার্থক্য হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হল:

১। শাসনের মধ্যে শিরক করা, বিধানাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা। আল্লাহ সুবহানাহু আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্ব দান করেছেন যেন আমরা এককভাবে তার ইবাদত করি, তার সাথে কাউকে শরীক না করি।

আমাদেরকে এই পার্থিব জীবনে অস্তিত্ব দান করেছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য, যাচাই করার জন্য, বিপদে ও ফিৎনায় ফেলার জন্য, যাতে দেখে নিতে পারেন আমরা কি আমল করি, দেখে নিতে পারেন কে তার আনুগত্য করে, তার রাসূলের অনুরসণ করে আর কে অহংকার করে, অবাধ্যতা করে, নাফরমানী করে ও নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন আমরা তার শরীয়ত দ্বারা শাসন পরিচালনা করি, তাতে অন্য কারো বিধান অন্তর্ভূক্ত না করি, শাসনের ক্ষেত্রে ও তার শরীয়ত শাসন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার সাথে কাউকে শরীক না করি, শুধু আল্লাহর আইন-কানুন, আল্লাহর বিধানাবলী এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধই আমরা পালন করি।

কিন্তু আমাদেরই স্বজাতীয়, আমাদেরই গোত্রীয় এবং আমাদের দলীয় কতক শ্রেণী আসলো, যারা আল্লাহর বিধানাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে বলল, আমরা আল্লাহর শাসন চাই না, আল্লাহর শরীয়ত চাই না, আমরা কুরআন, সুন্নাহ, হাদিস, ইলম, ফিকহ ইত্যাদি চাই না, আমরা এগুলোর কোন কিছু চাই না; আমরা চাই ফরাসী আইন, সুইজারল্যান্ডের আইন, ইংলিশ ও বৃটিশ আইন। যেকোন বিষয়ে নিজেরা গবেষণা করে আইন প্রণয়ন করব এবং আমাদের প্রণীত বা আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা প্রণীত আইন দ্বারা আমরা পরিচালিত হব।

এটা কুফর ও শিরক; এটা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। যে এটা করবে, সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত। এটা সম্পূর্ণরূপে কাফেরদের কুফরীর মত কুফর ও শিরক। এটার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন জিহাদ করতে এবং তাকে সাঙ্গ করার আগ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলাই আমাদের উপর এটাকে ইবাদত সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের থেকে ইবাদত হিসাবে এটা করার কামনা করেন যে, আমরা একমাত্র তার শরীয়ত দ্বারা শাসন করব, অন্য কোন কিছু মানব না।

তিনি আমাদেরকে আরো বলেছেন: আমার শরীয়ত, আমার বিধানাবলী ও আমার আদেশ-নিষেধ দ্বারা শাসন করা তোমাদের উপর অবশ্যকরণীয়, তোমাদের উপর ফরজ। এটাই ইবাদত, যা তোমরা আমার জন্যই নিবেদন করবে। আর এর বিপরীতে যখন তোমরা আমার দ্বীন, আমার শরীয়ত, আমার বিধানাবলী ও আমার আদেশ-নিষেধ দ্বারা শাসন করবে না, তখন তোমরা কাফের হয়ে গেলে এবং আমার দ্বীন থেকে বের হয়ে গেলে। এটা কুরআনে পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট ও পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন:

{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}

"হুকুম দানের অধিকার তো কেবল আল্লাহ তা'আলারই। তিনিই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না।" (সূরা ইউসুফ)

আয়াতে ব্যবহৃত "إن" হচ্ছে إن نافية অর্থাৎ না বোধক। তাহলে অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর শাসন ব্যতীত কোন শাসন নেই।

إِنِ الْحُكْمُ এর মধ্যে "إن" মূলত: সাকিনযুক্ত। কিন্তু দুই সাকিনের একত্র হওয়া থেকে বাঁচার জন্য তাতে كسرة দেওয়া হয়েছে।

"إن الحكم إلا لله" অর্থাৎ কোন হুকুম বা শাসন নেই একমাত্র আল্লাহর হুকুম বা শাসন ছাড়া, যার সাথে কোন শরীক নেই।

"أمر" অর্থাৎ তিনি তার সৃষ্টিজীবকে, তার বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন।

"ألا تعبدوا إلا إياه" আদেশ করলেন, হে মানুষ! হে সৃষ্টিজীব! তোমরা অন্য কারো ইবাদত করো না; একমাত্র তারই ইবাদত কর।

"ألا تعبدوا إلا إياه" শুধু তারই ইবাদত কর; অন্য কারো ইবাদত করো না।

"تعبدوا" "একমাত্র তারই ইবাদত করবে"- এর মধ্যে এ ব্যাপারে সতর্কবাণী রয়েছে, যে তার বিধানাবলী দ্বারা শাসন করা ও তার বিধানাবলী কার্যকর করা, এটা একটি ইবাদত, এটা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা বৈধ নয়।

"إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا" "হুকুম দানের অধিকার তো কেবল আল্লাহ তা'আলারই। তিনিই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর না।" অর্থাৎ তোমরা একমাত্র তার বিধানাবলীই কার্যকর ও বাস্তবায়ন করবে। এটাই তার ইবাদত।

"একমাত্র তারই ইবাদত করবে" তার বিধানবলী বাস্তাবায়ন করার মাধ্যমে এবং তার উপর আমল করার মাধ্যমে। কেননা শাসন ও বিধান তো কেবল তারই অধিকার, এব্যাপারে তার কোন শরীক নেই।

তাই এ বিষয়ে এই আয়াতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের অন্যান্য সূরায়ও এর মত আয়াত রয়েছে। এই বিষয়বস্তুটি পুরো কুরআনে বিস্তৃত। সামনে আরো কিছু আয়াত উল্লেখ করব ইংশাআল্লাহ।

কুরআনে এব্যাপারে অনেক আয়াত রয়েছে। তার মধ্যে আরেকটি হল আল্লাহ তা'আলা বলেন: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}

"তার শাসনকর্তৃত্বে কাউকে শরীক করে না।" (সূরা কাহফ)

আল্লাহ তা'আলা নিজ শাসনে কাউকে শরীক করেন না। অর্থাৎ কাউকে অংশীদার বানান না; বরং তিনিই একক শাসক। উদাহরণ হিসাবে আরো আয়াত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

"তোমরা যে বিষয়েই মতবিরোধ কর, তার মীমাংসা আল্লাহর কাছেই। তিনিই আল্লাহ, যিনি আমার প্রতিপালক। আমি তার উপরই ভরসা করি এবং তার অভিমুখী হই।" (সূরা শূরা)

"যে বিষয়েই"- এটা ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য।

"তোমরা যেকোন বিষয়ে মতবিরোধ কর" অর্থাৎ হে মানুষ! তোমাদের সত্তার সাথে সম্পর্কিত যেকোন ছোট বা বড় বিধান, যেকোন ধরণের, যেকোন মূল্যের, দুনিয়াবী, পরকালীন বা অন্য যেকোন ঝগড়া-বিবাদ, জেরা, ইত্যাদি...

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} *"তোমরা যে বিষয়েই মতবিরোধ কর, তার মীমাংসা আল্লাহর উপরই ন্যাস্ত।"* অর্থাৎ একমাত্র তার কাছেই, তার সাথে কাউকে শরীক ব্যতীত। তা আল্লাহ থেকেই তালাশ করবে, তার রিসালাত ও তার শরীয়তের মাঝেই তালাশ করবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন সূরা আরাফে:

{أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}

"স্মরণ রেখ, সৃষ্টি ও আদেশদান তারই কাজ। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ অতি কল্যাণময়।"

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিলেন, সৃষ্টি ও বিধান উভয়টিই শুধু তার; তার সাথে কেউ শরীক নেই। যেমন তার সাথে সৃষ্টিতে কেউ শরীক নেই, তেমনি শাসন ও আদেশে-নিষেধেও তার সাথে কেউ শরীক নেই।

অর্থাৎ যে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদেরকে আদেশ দিবেন, নিষেধ করবেন। তিনি তো বর্ণনা করে দিয়েছেন, কিভাবে তারা কাজ করবে, কিভাবে মুআমালা করবে, কিভাবে তার ইবাদত করবে। তিনি তাদেরকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বলে দিয়েছেন কিভাবে তার ইবাদত করতে হবে।

রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন, কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। তাতে তাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন কিভাবে তারা ইবাদত করবে, যেকোন বিষয়ে কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে। তিনি বলে দিয়েছেন: আমি তোমাদের সকলের শাসক; একমাত্র আমার শাসনই কার্যকর হবে।

উচিত হবে না, জায়েয হবে না, সঠিক হবে না এবং কখনো কারো জন্য সমীচীন হবে না আমার শাসন ব্যতীত শাসন করা।

বিবেকও এ কথাই বলে এবং এই ফায়সালাই দেয় যে, কোন শিল্পের শিল্পীই তার ভাল-মন্দের বিষয়টি ভাল জানবে- কিভাবে তার কল্যাণ হবে এবং তা বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচবে। সৃষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তাই এর জন্য যথোপোযুক্ত যে, তিনি তার জন্য আইন কানুন রচনা করবেন, বিধান প্রণয়ন করবেন- কিভাবে সে চলবে, কিভাবে কাজ করবে, যাতে ভাল থাকতে পারে, সর্বোত্তম অবস্থায় থাকতে পারে।

একারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন:

{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}

"যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত"!

একারণে মানুষের সত্তার জন্য, মানব সমাজের জন্য, দুনিয়ার জন্য এবং দুনিয়ার মধ্যে যত স্বার্থ ও যত কামনা-বাসনা ইত্যাদি আছে তার জন্য একমাত্র আল্লাহর শরীয়ত ও আল্লাহর বিধানাবলীর অনুসরণ ব্যতীত সফলতা বা উন্নতির কোন পথ নেই।

বিবেকও ফায়সালা দেয়, শরীয়তের বিধানও বলেছে এবং স্পষ্ট ও পরিস্কার করে দিয়েছে আর আল্লাহ তা'আলাও আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমরা তার শরীয়ত দ্বারাই শাসন করি, অন্য কিছুর দ্বারা শাসন না করি।

তিনি আমাদেরকে বলেছেন: এটা আমাদের পক্ষ থেকে তার জন্য ইবাদত, যা তার কাম্য, তাই আমাদেরকে এটা এককভাবে তার জন্য সপে দিতে হবে। তিনি তার সম্মানিত কিতাবে ও তার নবীর সুন্নায় স্পষ্ট, পরিস্কার ও অকাট্যভাবে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন তার শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করতে।

আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, যে তার শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে, সে তার শরীয়ত থেকে বের হয়ে যায়, তার দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

“যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা ফায়সালা করে না, ঐ সকল লোক কাফের।” (সূরা মায়িদা)

তাহলে তিনি আমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বলে দিলেন, যে তার শরীয়ত ব্যতীত ভিন্ন কিছু দ্বারা শাসন করে, সে তার দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে এবং কাফের হয়ে গেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আইন প্রণয়ন করে, সৃষ্টিজীবের জন্য বিভিন্ন বিধান রচনা করে এবং শাসনকর্তৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে দ্বন্দে লিপ্ত হয়, সে তাগুত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাকে তাগুত নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}

“তাদের কি এমন বহু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন বিধিবদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” (সূরা শূরা)

এই আয়াতটি প্রশ্ন আকারে। এখানে প্রশ্ন দ্বারা ‘না করা’ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রশ্নটি অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্ন। অর্থাৎ তার কোন অস্তিত্ব নেই।

তাদের কি আরো অনেক উপাস্য রয়েছে, যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোন কিছু বিধিবদ্ধ করে?

তাই আয়াতটি প্রমাণ করে, যে কেউ আল্লাহর আইনের বিকল্প আইন প্রণয়ন করে, সে নিজেকে আল্লাহর সাথে শরীক বানালো আর যে তার প্রতি সন্তুষ্ট হল সে তাকে আল্লাহর শরীক ও আল্লাহর সাথে ভিন্ন উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করল। তাই এটা শিরক।

সুতরাং আল্লাহর বিধানের বাইরে বিধান প্রণয়ন করা শিরক আর যে তাকে বিধানদাতা হিসাবে মানে- অর্থাৎ তার জন্য আল্লাহর বিধানের বাইরে বিধান প্রণয়ন করে দিবে, তার অনুসুরণ করে, সে তাকে আল্লাহর সাথে শরীক হিসাবে গ্রহণ করল তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার সাথে শরীক করল এবং কাফের হয়ে গেল, আল্লাহর দ্বীন থেকে বের হয়ে গেল।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কুরআনে এই মাসআলাটি পরিপূর্ণরূপে বয়ান করেছেন এবং তাকে স্পষ্ট করেছেন সর্বোত্তভাবে, যার চেয়ে উত্তম স্পষ্ট আর হতে পারে না। এটা হচ্ছে কুরআনের সবচেয়ে স্পষ্ট মাসআলাগুলোর একটি।

ফলে আল্লাহ তা’আলা একদল মুনাফিক সম্পর্কে বলেন, যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করত:

> { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}
>
> *“আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে তারা আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য যেতে চাচ্ছে। অথচ তাদেরকে আদেশকরা হয়েছিল, যেন সুস্পষ্টভাবে তাকে অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে চরমভাবে গোমরাহ করতে চায়।” (সূরা নিসা)*

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল:

জনৈক ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করত। সে মুনাফিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল, কিন্তু ইসলাম ও ঈমানের দাবি করত। সে জনৈক ইহুদীর সাথে বিবাদে জড়াল। অত:পর উভয়ে নবী করীম ﷺ এর নিকট আসল, যাতে নবী ﷺ তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেন। নবী ﷺ মিমাংসা করে দিলেন, ইহুদী সন্তুষ্ট হল, কিন্তু মুনাফিক নবী ﷺ এর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হল না।

তাই সে ইহুদীকে বলল, চল, আমরা আবু বকরের নিকট যাই। ইহুদী বলল, চল। উভয়ে গেল আবু বকরের নিকট। তারা আবু বকর রা: কে বলল, আমরা মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট গিয়েছিলাম, তিনি আমাদের মাঝে এই ফায়সালা করেছেন।

তখন আবু বকর রা: বললেন: নবী ﷺ যে ফায়সালা করেছেন সেটাই ফায়সালা। (ব্যাস, তারপর কারো কোন বিচার-ফায়সালা নেই।) উভয়ে আবু বকর রা: এর নিকট থেকে চলে গেল। তারা আবু বকরের ফায়সালায় সন্তুষ্ট হল না।

মুনাফিকটিই আবার বলল, চল, ওমরের নিকট যাব। উভয়ে ওমর রা: এর নিকট গেল। স্বাভাবিকভাবেই আপনারা ওমর রা: এর কঠোরতা ও হকের ব্যাপারে দৃঢ়তার কথা জানেন। তারা ওমর রা:কে বলল, আমরা মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট গিয়েছিলাম, তিনি আমাদেরকে এই ফায়সালা দিয়েছেন। কিন্তু আমার সাথী তাতে সন্তুষ্ট হয়নি।

তাই আমরা আবু বকরের নিকট যাই। তারপর উভয়ে ওমরের নিকট পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করল। ওমর রা: বললেন, তোমাদের মাঝে নবী ﷺ ফায়সালা করে দিয়েছেন? তারা বলল, হ্যাঁ, আমাদের মাঝে এই ফায়সালা করেছেন। তিনি বললেন, আর তোমরা সন্তুষ্ট হওনি? ইহুদীটি বলল, আমার সঙ্গী সন্তুষ্ট হয়নি।

ওমর রা: বললেন: তোমরা নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। এরপর তিনি ঘরে গিয়ে তরবারী বের করলেন।

তা নিয়ে দ্রুত আসলেন এবং মুনাফিকটির গর্দানে আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেললেন। তার মাথাটি উড়িয়ে দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, ইহুদীর মাথাও উড়িয়ে দিতে, কিন্তু ইহুদী পলায়ন করল।

তখন এই আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হল:

> { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ}
>
> *"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবি করে তারা আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য যেতে চাচ্ছে।"*

তাগুত কে? যে আল্লাহর আইনের বাইরে আইন রচনা করে। যে আল্লাহর বিধানের বাইরে এমন বিধি-বিধান প্রণয়ন করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। আল্লাহর বাণী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এবং আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি কোন তোয়াক্কা না করে সে নিজের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন করে। তার আল্লাহর বিধানের প্রতি কোন দৃষ্টি নেই, কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, এমন ব্যক্তিই তাগুত।

{يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} *"তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালার জন্য যেতে চাচ্ছে"*- অর্থাৎ এসকল মুনাফিকরা। তাহলে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাগুত বলে অভিহিত করলেন এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে আদেশ করে বললেন- *"অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করতে।"* কিন্তু তারা তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালা চায়, তাই আল্লাহ তা'আলা এরজন্য তাদেরকে নিন্দা করলেন এবং তাদের ব্যাপারে হুকুম আরোপ করলেন, তারা হচ্ছে মুনাফিক। কিন্তু তারা ধারণা করে, তারা ঈমানদার, প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়।

ওমর রা: তাকে হত্যা করার পর নবী ﷺ তার রক্তকে মূল্যহীন সাব্যস্ত করেন। নবী ﷺ বলেন: *"তার রক্ত মূল্যহীন।"*

জনৈক উপস্থিতি অনারবি ভাষায় প্রশ্ন করতে চায়। সে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করল– {ألم تر إلى الذين يزعمون آية الآية} তারপর {ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيدًا} তরজমা জানতে চায়-

আয়াতের শেষাংশ হল, আল্লাহ তা'আলা বলেন: *{وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}* অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে চরমভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়, সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পথভ্রষ্টতা। এটাই হচ্ছে *{وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}* এর অর্থ। যেহেতু সে তাদেরকে তাগুতদের নিকট বিচার প্রার্থনার দিকে নিয়ে গেছে। কারণ মূলে শয়তানই থাকে। প্রত্যেক কুফরীর পিছনে রয়েছে শয়তান, প্রত্যেক গুনাহের পিছনে রয়েছে শয়তান। শয়তানই এর কারণ। তাকে কুমন্ত্রণা দিয়েছে শয়তানই। আল্লাহ তার প্রতি অভিশম্পাত করুন!

সে-ই আদম সন্তানকে প্রতারিত করে। একারণে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: শয়তান চায় এর মাধ্যমে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে অর্থাৎ তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনার মাধ্যমে। দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা। এর থেকে এ কথা পাওয়া গেল যে, তাগুতের নিকট বিচার-ফায়সালা কামনা করা দূরবতী (গভীর) পথভ্রষ্টতা।

কখনো তার কাছে এই সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তো এই কাজটিকে কুফর বলেননি; দূরবর্তী পথভ্রষ্টতা বলেছেন? কারণ এ ধরণের সংশয় সৃষ্টি করা হয়ে থাকে?

এমনটা আমি মনে করি না, এটা উদ্দেশ্য নয়। স্বাভাবিকভাবেই আয়াতটি এব্যাপারে স্পষ্ট যে, এটা মুনাফিকদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, মুফাসসিরগণও এব্যাপারে পরিস্কার তাফসীর কছেন আর তার অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটও এমনই। আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

"তারা ধারণা করে, তারা ঈমান এনেছে।"

আল্লাহ তাদেরকে এব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করলেন এবং বলে দিলেন যে এটা নিছক তাদের ধারণা, এর কোন বস্তবতা নেই। তাই এটা নিফাক। আর নিফাক তো কুফর।

কুরআনের অন্যান্য অনেক আয়াত الكفر ও الطاغوت এর অর্থ স্পষ্ট করে। আরবি অভিধানে الطاغوت শব্দটি طغى يطغى থেকে নির্গত। طغى অর্থ হচ্ছে সীমাতিক্রম করল, সীমালঙ্ঘন করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

> **{إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ}**
>
> *"যখন পানি নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম।"*

তুফানের পানি। সায়্যিদুনা নূহ আ: এর তুফানের পানি। আল্লাহ তা'আলা আরেক জায়গায় বলেন:

> **{كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى}**
>
> *"বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে। এর কারণ হল, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।"*

কুরআনে একাধিক জায়গায় الطغيان শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। এটা হচ্ছে ঐ সকল গোড়া, অহংকারী ও অবাধ্য কাফেরদের বৈশিষ্ট্য, যারা সীমালঙ্ঘন করত।

সুতরাং তাগুত হল যে তার সীমালঙ্ঘন করেছে, দাসত্বের সীমা। অর্থাৎ তার ব্যাপারে অবধারিত বিধান হল, সে হল আল্লাহর বান্দা, কিন্তু সে দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে আল্লাহ তা'আলার সাথে তার শাসনের মধ্যে দ্বন্ধ করে, তার প্রতাপ ও বড়ত্বে তার সাথে ঝগড়া করে এবং তার বৈশিষ্ট্যাবলীতে তার সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করে।

তাই মহান সম্মানিত আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন, তাদের নাম দেন তাগুত বলে এবং আমাদেরকে আদেশ করেন তাগুতকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

“তাই যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে এক মজবুত হাতল ধরল, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।”

কুরআনের অনেক আয়াতে আমাদেরকে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার আদেশ করেছে।

{اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى}

“ফেরাউনের নিকট যাও, সে অবাধ্য হয়ে গিয়েছে।”

তারা সীমালঙ্ঘন করেছে, চরম সীমালঙ্ঘন। প্রতিপালক ও উপাস্য হওয়ার দাবি করেছে।

সে বলেছে:

{مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي}

“আমি তোমাদের জন্য আমি ব্যতীত কোন উপাস্য আছে বলে জানি না।”

আরো বলেছে: {أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} *“আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক।”*

সে বড় তাগুত। ফেরাউন ছিল তাগুতদের অন্তর্ভূক্ত।

তাহলে তাদের অবস্থা কি, যারা কাফেরদের নিকট তথা তাদের আইন-কানুনের নিকট বিচার প্রার্থনা করে!

তাহলে এই ব্যক্তি হচ্ছে তাগুত, সে আল্লাহর সাথে তার শাসনকর্তৃত্বে প্রতিদ্বন্ধিতা করছে, বান্দা হিসাবে যে সীমার মধ্যে তার থাকা উচিত ছিল, সে সীমালঙ্ঘন করে রব ও ইলাহ এর বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। তাই এই ব্যক্তি হচ্ছে তাগুত।

‘তাগুত’- এটা হচ্ছে অবাধ্যতার সেই রূপ, যার দ্বারা বান্দা তাগুত হয়ে যায়, সে মানুষের জন্য এমন আইন-কানুন প্রণয়ন করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।

তার মধ্যে আরেকটি হচ্ছে: উদাহরণত: উপাস্য হওয়ার দাবি করা। যেমন ফেরাউন, যে উপাস্য হওয়ার দবি করেছিল অথবা অন্য কোন লোক এরূপ দাবি করল।

আপনারা আগা খানকে চিনেন, এই দূর্বৃত্ত তাগুত, সে মানুষকে তার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে, নিজেকে ‘ইলাহ’র আসনে বসায়। সে তাগুত। এমনিভাবে কিছু সীমালঙ্ঘনকারী কাফের সুফী মানুষকে তাদের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে, এরা তাগুত।

অথবা যদি মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে তার ইবাদত করে এবং তাকে তাগুত হিসাবে গ্রহণ করে তাহলেও সে তাগুত। এসবগুলোই তাগুতের অর্থের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর আশ্রয় চাই।

এমনিভাবে প্রতিমা বা মূর্তি, বোজা ও এজাতীয় বস্তুসমূহ। যাকেই আল্লাহকে ছেড়ে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, আল্লাহকে ছেড়ে যারই ইবাদত করা হয়, সেই তাগুত। যেমন পাথর, গম্বুজ, কবর, ইত্যাদি, আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়।

মানুষ এগুলোকে তাগুত হিসাবে গ্রহণ করেছে, এগুলোকে মূর্তি ও ইলাহ বানিয়েছে। তাই এগুলো এই অর্থের অন্তর্ভূক্ত হয়ে তাগুত হয়ে গেছে, আল্লাহ ব্যতীত এদের ইবাদত করা হয়। এমনকি যদি কবরের অধিবাসী নেককার লোকও হয়, তথাপি সে এই অর্থের অন্তর্ভূক্ত।

সে যদি নেককার লোক হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে দোষমুক্ত করবেন- { أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} সে যদি নেককার হয়, এর প্রতি সন্তুষ্ট না হয় এবং এর আদেশ না করে, তবে আল্লাহ তাকে দোষমুক্ত করবেন। কিন্তু মানুষ তাদেরকে তাগুত হিসাবে গ্রহণ করেছে।

তাই কবর বা মাজারটিও আল্লাহর বিকল্প তাগুত। এগুলো সেরূপ উপাস্য হয়ে গেছে, আল্লাহর সাথে বা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয়। এমনভিবে যে বৃক্ষ, পাথর, নদী, সূর্য্য, চন্দ্র বা অন্য কোন জিনিসকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ ব্যতীত তার ইবাদত করা হয়, তাহলে উক্ত বস্তুগুলো আল্লাহ ব্যতীত তাগুত।

একারণে পার্লামেন্ট, যা আল্লাহ ব্যতীত আইন প্রণয়ন করে, এই পার্লামেন্ট তাগুত। মানবরচিত আইন, সেই রাষ্ট্রের আইন, যে রাষ্ট্র আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা শাসন করে না; নিজেদের আইন দ্বারা শাসন করে।

যে আইন তারা নিজেরা প্রণয়ন করেছে এবং পৃথিবীর জন্য আইন হিসাবে মনোনীত করেছে অথবা অন্যান্য জাতি থেকে গ্রহণ করেছে, তারপর সংযোজন করেছে, বৃদ্ধি করেছে, বিয়োজন করেছে, রহিত করেছে, কোনটাকে সামনে এনেছে, কোনটাকে পিছনে নিয়েছে, অত:পর নিজেদের জন্য আইন হিসাবে গ্রহণ করেছে।

প্রতিদিনই পার্লামেন্ট আইনের মধ্যে সংযোজন করে, নতুন আইন প্রণয়ন করে, যখনই কোন ঘটনা ঘটে, তখন উক্ত ঘটনা বা সমস্যার জন্য আইন প্রণয়ন করে, নতুন আইন রচনা করে। তাই এই পার্লামেন্ট তাগুত ও ইলাহ, আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হচ্ছে।

কেন? কারণ তারা বিধান রচনা করছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। আল্লাহ ব্যতীত, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত। তারা বিভিন্ন বিধান প্রবর্তন করছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।

আল্লাহ এগুলোর অনুমতি দেননি, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলাই আইন বানিয়েছেন, অনেক বিধি-বিধান দিয়েছেন, কিন্তু তারা সেগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তারা বলে: আমরা এগুলো চাই না, আমরা এগুলো পরিবর্তন করে ভিন্ন বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করব, যেগুলো আমাদের জন্য উপযোগী হবে, আমাদের অবস্থার সাথে, আমাদের যুগের সাথে এবং আমাদের দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

উদাহরণ স্বরূপ: আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিধান দিয়েছেন অবিবাহিত যিনাকারীকে একশত দুররাহ মারতে এবং বিবাহিত যিনাকারী বা যিনাকারীনীকে প্রস্তর মারতে, যতক্ষণ না মরে যায়, কিন্তু তারা বলে, না, যখন যুবক ও যুবতী পরস্পর সম্মতিতে যিনা করে, তখন কোন সমস্যা নেই। যখন ধর্ষণ হবে, সে তার সাথে জোরপূর্বক অন্যায় করবে, তখন তাকে (উদাহরণত:) দুই বছরের কারাদন্ড দেওয়া হবে।

তাই এটা হচ্ছে আল্লাহর হুকুমকে সমূলে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। এই সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম বিদ্যমান আছে, কিন্তু তারা সেটাকে পরিবর্তন করে, সেটাকে বিলুপ্ত করে ফেলে। তারা সেটার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সেটা চায় না। সেটা মানে না। তারা নিজেদের চিন্তা ও নিজেদের খুশিমত ভিন্ন কিছু আনয়ন করে, নিজেদের পক্ষ থেকে আবিস্কার

করুক বা অন্যান্য জাতি থেকে সংগ্রহ করুক। তাই এটা সরাসরি, স্পষ্ট ও পরিস্কার কুফর। কুফরের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট কুফর। এটা কুফর হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম সকলে একমত। এর মধ্যে পূর্বের বা বর্তমানের কোন আলেমের কোন মতবিরোধ নেই।

তাই এটাই একথার অর্থ: "যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।" কারণ এর অর্থ হল, তারা কখনোই আল্লাহর হুকুমকে মেনে নেয় না, অর্থাৎ তাদের এই ভাবনা থাকে না যে, এটা কি আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেছেন, না করেননি?

এটা আমাদের দেখার বিষয় নয়, এটা আমরা দেখব না, আমরা স্বাধীনমতে যা চাই তাই করব। আমরা যা ইচ্ছা বিধান বানাব। এটাই একথার অর্থ যে, তারা এমন আইনও প্রণয়ন করে, যা আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং এমন আইনও প্রণয়ন করে, যা আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেননি। এমন আইনও প্রণয়ন করে, যা আল্লাহ বলেছেন এবং এমন আইনও প্রণয়ন করে, যা আল্লাহ বলেননি। তাদের এটা কোন চিন্তার বিষয় নয়। তারা স্বাধীন। এটাই 'আল্লাহ যার অনুমতি দেননি' এর অর্থ।

কিন্তু ধরুন, আমাদের এখানে এই মারকাযে অনেক মুজাহিদদের সমাবেশ, আমরা যদি এরূপ একটি আইনের খসড়া তৈরী করি: দিনের বেলা এই ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ, শুধু রাত্রেই বের হওয়া যাবে, পানি আনা হবে এতটা বাজে, এমনিভাবে কাজগলো এভাবে বন্টিত হবে, অমুক দল এটা করবে আর তমুক দল ওটা করবে, এটা করা যাবে, এটা করা যাবে না- এটা জায়েয আছে।

এটা অননুমোদিত আইন প্রণয়ন নয়। কারণ এটা আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদিত। আমরা আল্লাহর নগন্য বান্দা, আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জিনিসগুলো অনুমোদিত। এটা আমাদের চিন্তা ফিকিরের অধীন। এটা আমাদের চিন্তার নিকট সোপর্দ করে দেওয়া হয়েছে, আমরা আইনের খসড়া বা আইন বা অন্য কিছু তৈরী করব কাজ সহজ করার জন্য। আমার একটি যৌথ ব্যবসায় আছে, আমার একটি কারখানা আছে, আমার এগুলো পরিচালিত হওয়ার কতগুলো নিয়ম-কানুন থাকে, এটা জায়েয। কেন?

কারণ আল্লাহ তা’আলা এ ব্যাপারে মানুষকে অনুমতি দিয়েছেন, তাতে কিছু অবতীর্ণ করেন নি। তিনি বলে দিয়েছেন, এটা তোমাদের ইখতিয়ারে, তোমরা যা চাও, কর। রাসূল ﷺ বলেছেন: *“তোমরাই ভাল জান, তোমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে।”*

একারণে এসমস্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে আইন বা আইনের খসড়া তৈরী করা জায়েয আছে, কারণ এটা শরীয়তের অধীন। আর আইন প্রণয়নের জন্য শর্ত হল, শরীয়তের অধীনে হতে হবে, অর্থাৎ শরীয়তের বিরোধী হতে পারবে না।

এমতাবস্থায় আমরা শরীয়তের উপরই আছি, তার বিরোধী কিছু করছি না। তার থেকে বের হয়ে যাচ্ছি না, তাকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করছি না। আমরা শুধু আমাদের জন্য অনুমোদিত বিষয়ে কাজ করছি। কারণ আমরা যথপোযুগী কাজ করার ও বিনষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আদিষ্ট।

আর আল্লাহ তা’আলা ঐ সমস্ত বিষয় আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন যেগুলোতে তাঁর কোন হুকুম নেই। রাসূল ﷺ বলেছেন: তোমরাই ভাল জান, তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে। তাই এটা বড় পার্থক্য এই মাসআলার মাঝে আর...

এই মাসআলাটির সাদৃশ্য হল, ফিকহী বিধি-বিধান সংক্রান্ত মাসআলাগুলোর সাথে। যা ফুকাহা ও উলামাদের মাধ্যমে উৎসারিত হয়ে থাকে। আমাদের ইমামগণ, আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত ইসলামের যত ইমামগণ আছেন তারা এমনটা করেছেন ও করবেন।

যখন একজন ফকীহ বা একজন আলেম কোন একটি মাসআলায় ফাতওয়া দেন, ফিকহ বা ফাতওয়ার বিষয়ে একটি কিতাব লিখেন, মানুষকে ফাতওয়া দেন, বিভিন্ন মাসআলা বলেন:

যখন এই এই ঘটবে, তখন তার হুকুম এই, তখন এটা করা ওয়াজিব, এট করা উচিত, ওটা করবেন না ইত্যাদি- তখন তিনি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করছেন তা বাদ দিয়ে ভিন্ন কিছুর মাধ্যমে ফায়সালা দিচ্ছেন না। বরং ইজতিহাদী মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে তিনি অনুমতিপ্রাপ্ত।

যে সমস্ত মাসআলা কুরআনে বা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত সুন্নায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত অথবা যার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে, চাই অকাট্য ইজমা হোক অথবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হোক, সেগুলোর ক্ষেত্রে তার বর্ণনাকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনাকারী ও আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে সংবাদদাতার স্থলে হবে।

আর ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর কালাম থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী থেকে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বাণীর মর্ম থেকে তথ কুরআন, সুন্নাহ ও তার ব্যাখ্যা ইজমা, কিয়াস, মাসলাহা (স্বার্থ বা সুবিধার চিন্তা) ও ইস্তিসহাব (পূর্ববস্থার প্রমাণ) থেকে তার হুকুম বের করেন। এরূপ আরও অনেক দলিলের বিষয় রয়েছে।

এক্ষেত্রে তিনি একজন আলেম ও ফকীহ। গবেষণা করে হুকুম বের করেন, হুকুমের উপর দলিল দেন এবং মানুষকে হুকুমের ব্যাপারে সংবাদ দেন।এটাই হচ্ছে ফাতওয়া। ফাতওয়া হল শরয়ী হুকুমের ব্যাপারে আবশ্যকীয়ভাবে সংবাদ দেওয়া।

তাহলে এই ফকীহ বা আলেম বা ইমাম, তিনি মানুষের জন্য ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করেন, যার অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। তাহলে তিনি আল্লাহর অনুমতিতে ও আল্লাহর শরীয়তের অধীনে থেকেই কাজ করেন; আল্লাহর শরীয়তের বিরোধিতা করেন না বা তার থেকে বের হয়ে যান না; বরং তিনি তার থেকে উদঘাটন করেন, তার থেকে চিন্তা করে বুঝেন এবং ঐ সমস্ত মাসআলাসমূহের হুকুম বের করেন, যার ব্যাপারে শরীয়তের স্পষ্ট বিবরণ নেই। সুতরাং উভয়টির মাঝে আসমান-যমীনের পার্থক্য।

অতএব বিধি-বিধান উদঘাটনকারী ফকীহ আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লার অনুমতির অধীনে কাজ করেন বা আইন প্রণয়ন করেন।

আর দ্বিতীয় মাসআলা আপন বিষয়বস্তুর উপরই আছে। তা হচ্ছে যদি পাকিস্তানী পার্লমেন্ট সদস্যরা এসে বলে: আইনের অনেক শাখা-প্রশাখা আছে: ব্যবসায়, শিক্ষা, স্বাস্থ, দ- তথা বিভিন্ন শাস্তি, ব্যক্তিগত বিষয়াদি তথা পারিবারিক অবস্থা-বিবাহ, তালাক, নারী, শিশু, প্রতিপালন, ভরণপোষণ- তারা এগুলোকে ব্যক্তিগত অবস্থাদি বলে থাকে- আমাদের আরব দেশগুলোতে এধরণের অনেক আছে, আমি ধারণা করি পাকিস্তানেও এরকম আছে- তারা ব্যবসায়, শিক্ষা, স্বাস্থ, স্বরাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় বিষয়াদি, বিচারব্যবস্থা

ও দন্ডবিধির ক্ষেত্রে নিজেরা আইন প্রণয়নের কাজ করে, অত:পর ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে এসে বলে এটা আমরা ফিকহে হানাফী থেকে নিব- অথবা আমাদের দেশে ফিকহে মালেকী, তাই বলবে এটা আমরা ফিকহে মালেকী থেকে নিব।

এভাবে তারা ফিকহের মাধ্যমে কৌশলের আশ্রয় নেয়, বলে আমরা শরয়ী বিধানাবলী বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছি- এমতাবস্থায় এসমস্ত পার্লামেন্টগুলোকে কি শরীয়ত দ্বারা শাসনকারী গণ্য করা হবে? না, কখনো না, এমনকি যে অংশে ফিকহের আলোকে করে থাকে তাতেও না।

কেননা তারা এমন আইন এজন্য করে না যে, এটা আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর শরীয়ত, তার হুকুম, তার নিষেধ, যেটা সে কঠোরভাবে মেনে চলে, কখনো তার গন্ডি থেকে বের হয় না- এটা কখখনোই না, এই পার্লামেন্ট তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী, কাফের। তা কখনোই দ্বীন দ্বারা অনুশাসিত নয়, আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা তা অনুশাসিত নয়।

অর্থাৎ তাদের এটা চিন্তার বিষয় নয় যে, এটা আল্লাহ আদেশ করেছেন, না করেননি? আল্লাহ একথা বলেছেন, না বলেননি? আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছেন, না করেননি, তিনি কিতাব নাযিল করেছেন, না করেননি?

আল্লাহর হুকুম থেকে দৃষ্টি নত করে, তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, তার প্রতি কোন লক্ষ্য না করে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছেমত, নিজ পছন্দমত পার্লামেন্ট শাসন করে। কোন একটি মাসআলার কোন একটি অংশে আল্লাহর হুকুমটি তাতে কতই না চমৎকার! তাই সেটা গ্রহণ করল, এটা কখনো আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী আইন করা নয়, বরং সে তো তার প্রবৃত্তি অনুযায়ী, যা তার কাছে ভাল লেগেছে, সে হিসাবে আইন করেছে।

চেঙ্গিস খান ও তার মত লোকেরা তো এমনটাই করেছিল, যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করত। সে-ই ছিল ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম আইন রচনাকারী। সে কিছু বিধান নিয়েছিল আমাদের শরীয়ত থেকে, কিছু নিয়েছিল অন্যান্য শরীয়ত থেকে আর কিছু নিজের প্রবৃত্তি ও চিন্তা-ভাবনা থেকে আবিস্কার করেছিল। সব মিলিয়ে একটি সংবিধান বানায়।

তাই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। অর্থাৎ এমনকি যদি সমস্ত পার্লামেন্ট সদস্য মিলে একটি জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করে আর জনগণকে বলে: পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে শরীয়ত দ্বারা শাসন করবে এবং সমস্ত পাকিস্তানী জনগণের জন্য এটা অবশ্যপালনীয় করেছে ও এর নির্দেশ দিয়েছে, যে শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাবে, আমরা তাকে শাস্তি দিব, কারণ সে পার্লামেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাহলেও এটা কোন উপকারে আসবে না।

অবশ্যই আমাদেরকে এই ভিত্তিতে আল্লাহর শরীয়ত ও আল্লাহর দ্বীন দ্বারা শাসন করতে হবে যে, এটা আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেছেন, আমরা এটা মেনে চলি, আমরা যদি তা থেকে বের হয়ে যাই তাহলে আমরা কাফের হয়ে যাব।

একারণে নয় যে, পার্লামেন্ট এটাকে আইন বানিয়েছে! পার্লামেন্টের শক্তিতে নয়; বরং এটা দ্বীন হওয়ার কারণে তার সত্তাগত শক্তিতেই আইন।

আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلِّ اللهم

وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.